ভোরের কাগজ
তারিখ APR. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

(গতকালের পর)

নিঃসঙ্গ বচন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ধর্ম শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা

৫.

আমার লেখার মূল বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা — এতোক্ষণ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের অবস্থান নিয়ে কথা বলা হয়েছে, এবারে শিক্ষা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা যেতে পারে।

আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপারটি এখনো গুরুত্ব দিয়ে নেওয়া হয়নি। এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেখলে মনে হতে পারে যারা এটি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন তাদের এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো আগ্রহ বা অভিজ্ঞতা নেই। শুধু তাই নয়, কেন জানি মনে হয় তাদের স্কুল কলেজে কোনো সন্তানসন্ততি নেই, থাকলেও তারা এই দেশের স্কুল কলেজে নয়, বিদেশে পড়াশোনা করে। যদি বা এই দেশে পড়াশোনা করে তারা নিশ্চয়ই সাধারণ স্কুল কলেজে পড়াশোনা করে না — তারা ইংরেজি মাধ্যমে O-level A-level ইত্যাদিতে পড়াশোনা করে যেন এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অভিশাপগুলো কোনোভাবে তাদের স্পর্শ করতে না পারে। শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তারা যখন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে তাদের নিজেদের জীবনের কোনো অংশই এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে নির্ভরশীল নয় — তখন তারা এটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন, সহজ অংকে সেটিকে অনুবাদ করলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় আট দশ লাখ ছাত্রের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। যারা এটিকে পরিচালনা করেন তারা নিশ্চয়ই এক ধরনের ভয়ংকর আত্মবিশ্বাসী এবং স্বেচ্ছাচারী মানুষ, পুরোটা নিশ্চয়ই নির্ভর করে এক দুজন মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপরে। তা না হলে এক বছর কেমন করে একটি নতুন পেপার পড়তে বাধ্য করা হয় এবং পরবর্তী বছর কেমন করে সেটি বাতিল করে দেওয়া হয়? পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রকাশিত হওয়ায় সেই পরীক্ষা বাতিল করে কীভাবে আবার উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের চাপে সেই পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণাটিই বাতিল করে দেওয়া হয়? নকল ইত্যাদির ব্যাপারটি কেমন করে মোটামুটিভাবে একটা উৎকট সামাজিক আন্দোলনের রূপে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা হয়? পরীক্ষা উপলক্ষে শুধু ছাত্র নয়, অভিভাবক, বন্ধু-বান্ধব, সামাজিক কর্মী, এমন কী শিক্ষক এবং পুলিশও নকল সরবরাহের কাজে লেগে যান? পুরো ব্যাপারটিতে শেখা বা জানার কোনো ব্যাপার নেই। পরীক্ষাশেষে সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট নামক কিছু কাগজপত্র হাতে ধরিয়ে দেওয়াই এই পুরো প্রক্রিয়াটির একমাত্র উদ্দেশ্য।

এটি হচ্ছে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ আরো অনেক ভয়াবহ। প্রচলিত স্কুল ব্যবস্থায় তবুও মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটি পাঠ্যসূচি রয়েছে, কিছু শিক্ষক কিছু শিক্ষার উপকরণ রয়েছে, কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সেগুলোও নেই। অবকাঠামোগত উন্নতি না করে কৃত্রিমভাবে শুধু ছাত্র সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে — তার ফলশ্রুতিতে এই দেশে এখন ৮ লাখ এস. এস. সি. পরীক্ষার্থী এবং তার সমমানের দাখিল পরীক্ষার্থী প্রায় ১ লাখ।

প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ধরনের উদ্দেশ্য থাকে — প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সেই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষায় বা ব্যবহারিক/ভোকেশনাল শিক্ষায় প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া। তার সঙ্গে সঙ্গে সুনাগরিক, দেশপ্রেম, চরিত্র গঠন এই ব্যাপারগুলোও থাকে, তবে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সেগুলো খুঁজে পাওয়া মুশকিল বরং যেটা উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে সৃজনশীলতাকে একেবারে শৈশবেই গলাটিপে হত্যা করে ফেলা। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশোনার উদ্দেশ্য ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহকালীন জীবনে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে দেওয়া। সে জন্য এস. এস. সি এবং এইচ. এস. সির সমমান হিসেবে দাখিল ও আলিম পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এক পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অন্য পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থায় যাওয়া। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে এবং ইচ্ছে করলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেও ছাত্ররা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে। উদ্দেশ্যটি চমৎকার, কিন্তু যদি বাস্তবে সেটিকে কার্যকর হতে দেখা না যায় অর্থাৎ দাখিল ও আলিম পাস করে ছাত্ররা যদি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে না পারে, তাহলে স্বীকার করে নিতে হবে মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবন নিয়ে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল সেই অঙ্গীকারটুকু পালন করা হয়নি।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে এর ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বলে এই ব্যাপারটুকু খুব ভালো করে জানি। নীতিগতভাবে এস. এস. সি- এইচ. এস. সি অথবা দাখিল-আলিম পাস করে একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। কিন্তু সব সময়েই একটি বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য কিছু পূর্বশর্ত থাকে (যেমন বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিষয়ের জন্য অংক ও পদার্থ বিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতির জন্য অংক ইত্যাদি ইত্যাদি) এবং মাদ্রাসার শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয় বলে কখনোই এই শর্তগুলো পূর্ণ করার সুযোগ পায় না। প্রতি বছরই ভর্তি পরীক্ষার আগে আমার সঙ্গে কিছু মাদ্রাসা ছাত্রের দেখা হয় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য আগ্রহী কিন্তু পাঠ্যসূচিতে সঠিক বিষয়গুলো না থাকার কারণে কিংবা কাগজে কলমে থাকলেও ঠিকভাবে শিক্ষা দেয়া হয়নি বলে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল- আলিম পাস করে কতোজন ভর্তি পরীক্ষায় টিকে বিজ্ঞান অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছে তার খোঁজ নিয়ে আবিষ্কার করেছি সংখ্যাটি ভয়ংকর রকম কম। আমার কেন জানি মনে হয় এই ছাত্রগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। শুধুমাত্র কাগজে কলমে তাদের এস. এস. সি এবং এইচ. এস. সি. এর সমমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃত অর্থে তারা কোনোভাবেই তাদের সমমানের নয়। কাজেই তাদের আমলে তাদের নিজেদের পছন্দের উচ্চ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেখা যায়, অল্প কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটিকতক বিষয় ছাড়া তাদের পড়াশোনার সুযোগ বলতে গেলে নেই। ৮ লাখ এস. এস. সি পরীক্ষার্থীর জন্য সকল সম্ভাবনার দ্বারই উন্মুক্ত কিন্তু মাদ্রাসার ১ লাখ দাখিল পরীক্ষার্থীর জন্য সব কিছুই রুদ্ধ, এটিই যদি বাস্তবতা হয়ে থাকে তাহলে এই বিশাল মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে বলে দাবি করা যায়?

কেমন করে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রকৃত ইতিহাসের কথা আমরা সবাই জানি। মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারটি প্রকৃত শিক্ষাকে মাথায় রেখে দাঁড় করানো হয়নি। কে কতগুলি মাদ্রাসা তৈরি করে কতো বড়ো ধর্মপ্রেমিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে হঠাৎ করে এই দেশে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মাদ্রাসার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। মাদ্রাসার এই ছাত্রদের দায়দায়িত্ব এই

> নিজের ধর্মের জন্য ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের ধর্ম অন্যের সংস্কৃতির জন্য একটি গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে এবং এই বোধটি আমাদের চেতনায় বপন করে দিতে হবে খুব শৈশবে। স্কুলের একেবারে প্রথম পাঠ গ্রহণ করার সময় একটি শিশুকে এই ব্যাপারগুলো শিখতে হবে।

দেশের মানুষকে নিতে হবে। তাদের অকিঞ্চিতকর একটি শিক্ষা দিয়ে দেশের জন্য একটা বোঝা হিসেবে উপস্থিত করে তাদের মনকে হতাশাগ্রস্ত করা হলে সেটি দেশের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সমস্যা ডেকে আনতে পারে। দেশের ধর্ম ব্যবসায়ী, স্বাধীনতার পরাজিত শত্রু, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তি এই মাদ্রাসার ছাত্রদের হতাশাগ্রস্ত হিসেবে পেলে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শুরু করবে, সেটি এখন আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাভুক্ত নয়, অনেকটা নিজেদের ইচ্ছেমতো পরিচালিত হয়। এই ধরনের কিছু মাদ্রাসা — যেগুলো কওমী মাদ্রাসা নামে পরিচিত — ইতিমধ্যে কিছু ধর্মান্ধ মানুষের কুক্ষিগত হয়েছে। কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই বলে এই ধরনের কিছু মাদ্রাসায় তালেবানি কায়দায় সহিংসতা শেখানো হয় বলে রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — আমাদের সরকার সেটি গুরুত্ব দিয়ে নেবেন, আমরা সবাই সেটি আশা করি।

৬.

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ৩০ বছর পরেও আমাদের দেশে কোনো শিক্ষানীতি নেই — সেটি নিয়ে আমাদের খুব মাথাব্যথাও নেই। আমাদের সৌভাগ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর একটি প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি পেশ করা হয়েছে। নীতিটি অত্যন্ত অল্প সময়ে দাঁড় করানো হয়েছে বলে এর মাঝে খানিকটা অগোছালো ভাব রয়েছে। শোনা যাচ্ছে যে কোনোদিন এই নীতিটি জাতীয় সংসদে পেশ করা হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এ শিক্ষানীতিটিকে দুই দিনব্যাপী একটি সিম্পোজিয়ামের ভিতর দিয়ে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে আলোচনাশেষে একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন। পুরো জাতির সঙ্গে আমরা সবাই এই শিক্ষানীতির ওপরে আলোচনাটুকু শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

এই প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের মাঝে একই সঙ্গে দেশের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার সমস্যাটুকু সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা — এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধারায় ছাত্রছাত্রীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। দেশের ভবিষ্যতের জন্য অন্ততপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাটুকু সবার জন্য এক এবং অভিন্ন হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে প্রথম ৮ বছরকে প্রাথমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশের সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য এক এবং অভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের কথা সুপারিশ করা হয়েছে। যারা পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় যেতে চাইবে তাদের মূল পাঠ্যসূচির পাশাপাশি ধর্মবিষয়ক পাঠ্যসূচি থাকবে, যারা ইংরেজি মাধ্যমে যেতে চায় তাদের বাড়তি ইংরেজি বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ থাকবে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু গ্রহণ করা হলে আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের সকল ছাত্রছাত্রীকে এক এবং অভিন্ন পাঠ্যসূচির ভিতরে এনে সবাইকে একই মাপে দেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা, সততা সাহস এবং সৃজনশীলতা শেখানোর একটি সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ধরনের কোন সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এ দেশের মাটিতে বসেই শিক্ষার মাধ্যমে নামে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ঘটে যেতে পারে। ইংরেজি মিডিয়ামের একটি স্কুলের ইসলামিয়াত বইয়ে

আমি জামায়াতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক দলটি সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বাক্য আবিষ্কার করেছি। স্কুলের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের যদি এই রাজনৈতিক দলটির সঙ্গে পরিচয় করিয়েই দিতে হয় তাহলে সবার আগে জানাতে হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাদের বিরোধিতার কথা, আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী হত্যায় তাদের ভূমিকার কথা। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা না হলে শিক্ষার পুরো কাঠামোই অর্থহীন হয়ে যাবে।

৭.

আমরা সবাই জানি, সারা পৃথিবী জুড়ে তথ্য বিপ্লব নামে একটি বিপ্লব শুরু হয়েছে। শিল্প বিপ্লবে যারা অংশ নিয়েছিল পরবর্তী ২০০ বছর তারা সারা পৃথিবীকে শাসন এবং শোষণ করেছে। এই তথ্য বিপ্লবে যারা অংশ নেবে তারা কী করবে আমরা এখনো জানি না কিন্তু যারা অংশ নেবে না তারা যে আবার পৃথিবীর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য বর্তমান সরকার তথ্য বিপ্লবে অংশ নেওয়ার জন্য দেশকে প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করছেন। স্কুল পর্যায়ে কম্পিউটারের শিক্ষা কার্যক্রম দাঁড় করানো হয়েছে, কম্পিউটার থেকে কর তুলে নেওয়া হয়েছে, সফটওয়্যার শিল্প নির্মাণের জন্য ব্যাংক থেকে টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কপি রাইট আইন তৈরি হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই তথ্য বিপ্লবে অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের সবার আগে যে জিনিসটির প্রয়োজন সেটা হচ্ছে জনশক্তি এবং সেটা তৈরি করার জন্যও রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে যে পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয়েছে সেটি ইতিমধ্যে অনেক স্কুলে শুরু করা হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সত্যিকারের আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা এখনো এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করতে এগিয়ে আসছে না। এর কারণটি খুব সহজ। একজন ছাত্র কয়টি ঐচ্ছিক বিষয় নি[...] পারবে তার সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে[...] কম্পিউটার বিজ্ঞান একটি ঐচ্ছিক বিষয় হওয়ার কারণে এটি গ্রহণ করতে হলে ঐচ্ছিক গণিত বিষয়টির মায়া ত্যাগ করতে হবে। যারা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় তারা কিছুতেই ঐচ্ছিক গণিত পরিত্যাগ করতে পারে না ফলে কিছুতেই তারা কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে না।

সমস্যাটি জটিল হলেও তার সমাধানটি খুব সহজ, এখন বাধ্যতামূলকভাবে যে ইসলামিয়াত বিষয়টি রয়েছে সেটিকেও ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যাপারে সুযোগ অনেক বেড়ে যাবে। তবে এই সহজ সমাধানটি গ্রহণ করার মতো সাহস বর্তমান সরকারের আছে কী না আমি সে ব্যাপারে এতো নিশ্চিত নই। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইসলামিয়াত বিষয়টির নম্বর সংখ্যা কমিয়ে অর্ধেক করেছিলেন এবং তার প্রতিবাদে দেশের ধর্ম-ব্যবসায়ীরা রাস্তাঘাটে গোলযোগ শুরু করে দেওয়া মাত্রই বর্তমান সরকার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়েছিলেন। যে দেশে রাস্তাঘাটে গাড়ি ভাংচুর করে দেশের পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করা যায় সেই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দেশের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করবেন দেশের শিক্ষাবিদেরা এই সহজ সত্যটি কী বোঝা এতোই কঠিন?

৮.

একজন মানুষ তার আপন জিনিসটিকে ভালোবাসার জন্য কোনো যুক্তি-তর্ক ব্যবহার করে না। সে কারণে আমরা একদিকে যেরকম আমাদের সাদামাটা আপনজনকে ভালোবাসি ঠিক সেরকম আমাদের ঐতিহ্যশালী ভাষাটিকেও ভালোবাসি। বাংলাদেশ সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে ভাষাকে ভালোবেসে তার জন্য জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিনকে আলাদা করে রাখা হয়েছেন। আমাদের দেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের একটি, রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশটি প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে, মানুষের জীবন প্রায় দুর্বিষহ তবু এই দুঃখী অসহায় দেশটির জন্য আমাদের বুকে গভীর মমতা, তার একটিই কারণ, এটি আমার নিজের দেশ। ঠিক একইভাবে এই দেশে যারা মুসলমান তাদের গভীর ভালোবাসা রয়েছে মুসলমান ধর্মের জন্য, যারা হিন্দু তাদের গভীর মমতা রয়েছে হিন্দু ধর্মের জন্য। যারা বৌদ্ধ তারা ভালোবাসে বৌদ্ধ ধর্মকে, যারা খ্রিস্টান তারা ভালোবাসে খ্রিস্ট ধর্মকে। নিজের ধর্মের প্রতি এই ভালোবাসা এবং মমত্ববোধ অন্য ধর্মকে ঘৃণা করে আসতে পারে না, ধর্মে কোনো ওয়ার্ল্ড কাপ নেই, এখানে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের প্রতিযোগিতা হয় না। সবার কাছেই তার নিজের ধর্ম হচ্ছে সত্য ধর্ম এবং সেটিই হচ্ছে ধর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো সত্য। সত্যিকারের একজন ধর্মভীরু কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না, কারণ শুধুমাত্র একজন সত্যিকারের ধর্মভীরু মানুষই অনুভব করতে পারে ধর্মের প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাস কতো গভীর হতে পারে। অন্য ধর্মের একজন মানুষ ঠিক তার মতোই গভীর ভালোবাসা এবং বিশ্বাস নিয়ে তার ধর্ম পালন করছে জানতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই তার জন্য মনের ভিতরে সম্ভ্রমবোধ জেগে ওঠার কথা।

আমাদের নতুন প্রজন্মকে এই চেতনাকে বুকে ধারণ করে বড়ো হতে হবে। নিজের ধর্মের জন্য ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের ধর্ম অন্যের সংস্কৃতির জন্য একটি গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে এবং এই বোধটি আমাদের চেতনায় বপন করে দিতে হবে খুব শৈশবে। স্কুলের একেবারে প্রথম পাঠ গ্রহণ করার সময় একটি শিশুকে এই ব্যাপারগুলো শিখতে হবে। তাদের জানতে হবে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকারের কথা। তাদের জানতে হবে পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির কথা। তাদের জানতে হবে নানা ধর্মের কথা নানা সংস্কৃতির কথা। আমাদের দেশের জন্য এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে প্রাথমিক স্কুলে সকল বাচ্চাদের আমাদের দেশের প্রধান ধর্মগুলোর কথা (মুসলমান, হিন্দু, খ্রীস্টান এবং বৌদ্ধ) জানতে হবে। যখন তাদের ভিতরে এই দেশের সকল ধর্মের সম্পর্কে একটি সুস্থ চেতনা গড়ে উঠবে তখন তারা নিজের ধর্মকে শিখতে পারবে সত্যিকারের ভালোবাসা দিয়ে। সবাইকে অনুভব করতে হবে যে এই পৃথিবীতে নানা ভাষা, নানা বর্ণ, জাতি ধর্ম এবং সংস্কৃতির মানুষ রয়েছে এবং এই বৈচিত্র্যই হচ্ছে পৃথিবীর প্রকৃত সৌন্দর্য। আমরা আর রাষ্ট্র নামক ছোট গণ্ডীর ভিতরকার মানুষ নই আমরা সবাই বৃহত্তর পৃথিবীর একজন অধিবাসী, আমাদের দায়বদ্ধতা সারা পৃথিবীর জন্য।

এই বিশ্ব-নাগরিকবোধ, পৃথিবীর বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান বোধের বীজ বপন করার জন্য এ দেশের সকল শিশুকে নিজের ভাষা, নিজের দেশ, নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানার আগেও জানতে হবে তার বাইরে আরো একটি বড়ো জগৎ রয়েছে। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর একটি অংশ — যখন সেই বোধ ভিতরে স্পষ্ট হবে শুধু তখনই আমরা আমাদের আপন সত্যটুকু সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবে — তার আগে নয়।

(৫) সুলতানা কামাল, সেদিনের শাহবানু আজকের শামসুন নাহার, ভোরের কাগজ, ১৪ অক্টোবর ১৯৯৮।

[জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন-এর অষ্টাদশ জাতীয় সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ]

মুহম্মদ জাফর ইকবাল : সায়েন্স ফিকশন লেখক অধ্যাপক, শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।